বঙ্গমানস ও অন্যান্য

ক্ষিতিমোহন সেন

সম্পাদনা
প্রণতি মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

কয়েক বছর আগে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধসংকলন প্রকাশের ইচ্ছায় কাজ শুরু করেছিলাম। তারই তৃতীয় খণ্ড এবার প্রকাশের জন্য যখন প্রস্তুত, ভূমিকা লিখতে বসে ক্ষিতিমোহন সেনের পুত্র স্বর্গত ক্ষেমেন্দ্রমোহন (কঙ্করদা নামেই যিনি বেশি পরিচিত ছিলেন) সেনের কথা এবং তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সদ্যপ্রয়াতা অমিতা সেনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। বরাবরই আমার ধারণা কঙ্করদা বোধহয় একসময় তাঁর পিতার সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলি বা তার নির্বাচিত অংশ গ্রন্থাকারে সংকলনের কথা ভেবেছিলেন এবং সেজন্য কিছু প্রবন্ধের যথাযথ প্রতিলিপি তিনি তৈরি করান। যে-কোনো কারণেই হোক সে-কাজ তেমন গতি পাবার আগেই থেমে যায়। অবশ্য এ-সবই আমার অনুমানমাত্র। আমি যখন ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনীপ্রণয়নে উদ্যোগী হয়ে তাঁর কাছে যাই, তিনি তখন খুব অসুস্থ। বেশি কথা বলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে কিছু মুদ্রিত প্রবন্ধের ফাইলকপি এবং সেই হাতেলেখা প্রবন্ধপ্রতিলিপিগুলি দিয়েছিলেন। আর অমিতাদির কথা কী বা বলব। তাঁর আগ্রহ সহযোগিতা এবং ঐকান্তিকতার সীমা কোথাও ছিল না। উভয়ের কাছেই প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলাম, সে কথা কোনোদিন ভুলব না।

সহায়তা ও উৎসাহের সিঞ্চনে কেমন ফসল ফলল, কঙ্করদাকে তা দেখাতে পারি নি। *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* প্রকাশের আগেই তিনি লোকান্তরিত হন। অমিতাদি দেখেছিলেন। তার আগে পাণ্ডুলিপি-আকারে এই জীবনী তাঁকে পড়ে শোনাবার অবকাশ হয়েছিল।

তারপর প্রবন্ধসংকলনের প্রথম খণ্ড *সাধক ও সাধনা* (জানুয়ারি ২০০৩) এবং দ্বিতীয় খণ্ড *ভারত পরিক্রমা* (২ ডিসেম্বর ২০০৪) দেখেও খুব খুশি হয়েছিলেন। তৃতীয় খণ্ড *বঙ্গমানস ও অন্যান্য* আর তাঁর হাতে দেওয়া হল না। এটি প্রকাশের আনন্দের সঙ্গে তাঁর বিয়োগব্যথাটুকুর স্পর্শ লেগে রইল মনে।

ক্ষিতিমোহন সেনের এই তিন খণ্ড প্রবন্ধসংকলনে প্রসঙ্গত কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথ বা শান্তিনিকেতনের নাম এসেছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি এতে স্থান পায়নি। একটি পৃথক খণ্ডে প্রকাশের জন্য সেগুলি বাছাই করে রাখা হয়েছে। সেটি হবে এই প্রকল্পের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড।

সাধক ও সাধনা-য় প্রবন্ধ ছিল চুয়ান্নটি, *ভারত পরিক্রমা*-য় আটান্নটি। *বঙ্গমানস ও অন্যান্য* গ্রন্থে ষাটটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হল। বঙ্গদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাধনা বিষয়ক ইতিহাস নিয়ে

ক্ষিতিমোহন সেনের দুটি গ্রন্থ আছে, *বাংলার সাধনা* (১৯৪৫) এবং *চিন্ময় বঙ্গ* (১৯৫৭)। এর বাইরেও এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণের সংখ্যা খুব কম নয়। বর্তমান সংকলনের 'বঙ্গমানস' অংশে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হল। আলোচ্য বিষয়ের বহু বৈচিত্র্যের দিকটিতে অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণতা আনার আকর্ষণে কয়েকটি এমন প্রবন্ধও দেওয়া হল, যেগুলি *বাংলার সাধনা* বা *চিন্ময়বঙ্গ* ভুক্ত হয়েছিল। তবে তার সংখ্যা অল্পই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলার বাণী পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'মধ্যযুগে সাধনার পীঠ ঢাকা'। কঙ্করদার কাছ থেকে এটি পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রকাশকাল আমার অজানা। শুধু এইটুকুই নয়, আমার অক্ষমতার সীমা আরও অনেকটাই ব্যাপ্ত। পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকায় ক্ষিতিমোহন সেনের আরও প্রবন্ধ ছড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়, যা আমার নাগালের বাইরে থেকে গেল। জন্মসূত্রে কাশী ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, আর কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনে এসে চল্লিশ বৎসরাধিককাল তিনি একটানা পশ্চিমবঙ্গে বাস করেছেন। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ভবিষ্যতে হয়তো বাংলাদেশের কোনো তন্নিষ্ঠ গবেষকের সেখানকার পুরোনো পত্রপত্রিকায় অনুসন্ধানের ফসল এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের মনের ক্ষুধা মেটাবে। আর এপার বাংলার পত্রিকা থেকেই যে তাঁর সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পেরেছি, এমন দাবিও করি না। শ্রী অশোক উপাধ্যায় 'প্রাচীন তমলুকের জৈনধর্ম' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধের সন্ধান দিয়েছেন, যেটি মেদিনীপুরের মানিকপুর কিশোর সংঘের পত্রিকা জনপদ বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৫-তে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস। সে প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি। এরকম আরও প্রবন্ধ তাঁর থাকতে পারে নানা পত্রিকায়। সুতরাং অন্বেষণের আরও সুযোগ আছে।

বাল্যকাল থেকে সাধুসন্তের সঙ্গাভিলাষী, বাউল সাধক ও তাঁদের সাধনার মর্মান্বেষণে তৎপর, দেশের বহুবিচিত্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর পরিণত বয়সে কতকগুলি রচনায় জীবনের সে-সব অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়েছিলেন। 'স্মৃতর আলোয়' অংশে তাঁর সেই ধরনের প্রবন্ধগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। বহু বিশিষ্ট সমকালীন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সুপরিচয় ছিল। সে তুলনায় তাঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন কমই। তবু যা লিখেছেন, এই বিভাগে সেগুলিও রইল। তাঁর 'গান্ধিজির তিরোধান' কিছুটা ব্যতিক্রমী হওয়া সত্ত্বেও এই অসামান্য প্রবন্ধটিকেও এই গুচ্ছভুক্ত করেছি। এতে লেখকের নিজের স্মৃতির অংশ গৌণ। ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ দিল্লিতে গান্ধিহননের দুঃসংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছাল, ক্ষিতিমোহন সেন তখন প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো বেড়িয়ে ফিরছেন, এবার দিনাবসানের শান্ত অন্ধকারে একটুক্ষণ একান্তে চুপ করে বসবেন। এমনসময় বিশ্বভারতীর ছাত্র হায়দার চৌধুরী দৌড়ে এসে তাঁকে এই ভয়ানক খবরটা দিলেন। ততক্ষণে গৌরপ্রাঙ্গণ থেকে বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত আশ্রমবাসীকে সেখানে সমবেত হবার আহ্বান জানাতে শুরু করেছে। সেই বেদনাদীর্ণ শোকস্তব্ধ আশ্রমিক সমাবেশে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সেদিন গম্ভীরকণ্ঠে থেমে থেমে অল্প কয়েকটি কথায় গান্ধিহত্যার ভয়াবহ ঘটনার সংবাদ দিলেন। পরদিন সকালে সকলে যখন মন্দিরে মিলিত হলেন বিশেষ স্মরণোপাসনায়, তখনও আচার্যের আসনে বসে তিনি

সেই অমূল্য জীবনের আকস্মিক অবসানের পটভূমিতে সেই অমর প্রাণের মূল্যনিরূপণ করলেন, বিশ্লেষণ করলেন এই হত্যার তাৎপর্য। সেদিনের সেই উপাসনায় যেমন, এই প্রবন্ধেও তেমনিই ক্ষিতিমোহন সেন কিন্তু শোকের কথা বলেন না, হায় হায় করেন না, সমস্ত জাতিকে কঠিন আত্মসমীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে তার সেই তৎকালিক শোকার্ত বিপন্নতার মুখোসটা যেন কেড়ে নেন।

সাধক ও সাধনা, ভারত পরিক্রমা, বঙ্গমানস, স্মৃতির আলোয়, শ্রেণিগতবিচারে এর কোনোটিতে স্থান পায়নি, এমন কিছু বিচিত্রস্বাদের রচনা তাঁর আছে। এগুলিকে এই খণ্ডের শেষাংশে বিন্যস্ত করা গেল। এই 'বিবিধ' বিভাগ-অন্তর্গত 'জন্ম ও মৃত্যু' ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুর বহুপরে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সবশেষে রইল কয়েকটি ছোটোদের উপযোগী রচনা। শান্তিনিকেতনে বিনোদনপর্বে অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ-একজন ছাত্রদের গল্প বলতেন। ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন নামকরা গল্পবলিয়েদের একজন। তাঁর কোনো কোনো ছাত্র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার সরস বর্ণনা দিয়েছেন। হয়তো এই অল্প কয়েকটি রচনা সেকালের মৃদু একটু সুবাস বয়ে আনবে।

গ্রন্থসম্পাদনায় পূর্বখণ্ডগুলির নীতিই অনুসৃত হয়েছে, তার আর উল্লেখ করছি না। শ্রদ্ধেয়া গীতা চক্রবর্তী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েকটি প্রবন্ধের প্রতিলিপি করে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গমানস'-এর প্রেসকপিতেও তাঁর হাতের ছোঁওয়া রইল। ঋণের কথা বলব না। ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ নাড়াচাড়া করার আনন্দ তাঁর শ্রমের যোগ্য মর্যাদাদান করেছে, এ কথা জানি।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি, শ্রীযুক্ত অভীক সরকারের বদান্যতায় আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসলাইব্রেরির সহৃদয় সহায়তা *ভারত পরিক্রমার* জন্য যেমন পেয়েছিলাম, তেমন পেয়েছি এবারেও। গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শক্তিদাস রায় ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

চৈতন্য লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার প্রভৃতি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে-থাকা যে-মানুষগুলি আমাদের প্রবন্ধসংগ্রহ কাজে কোনো-না-কোনো ভাবে সহায়ক হয়েছেন, তাঁদের সকলকে নমস্কার। তাঁরা সকলে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত অশোক উপাধ্যায় নিজে গবেষক এবং সেইসঙ্গে গবেষক-বন্ধু তিনি। ইতিপূর্বেও তাঁর কাছে সাহায্য পেয়েছি। এবারেও চলার পথে মালঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকা থেকে তিনি আমাকে ক্ষিতিমোহন সেনের কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান দেননি শুধু, সংগ্রহও তিনিই করে দিয়েছেন। নাহলে এগুলি আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যেত। গল্পভারতী এবং পাঠশালা পত্রিকার রচনাগুলিও তাঁর সৌজন্যেই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। এইখানে বলে রাখি সোনার কাঠিতে প্রকাশিত 'পাষাণ নৌকা' রচনাটি অন্যসূত্রে পেয়েছি, কিন্তু তার প্রকাশকাল দিতে পারিনি।

ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধসংকলন প্রকাশের দায়িত্বগ্রহণ করে পুনশ্চ প্রকাশনসংস্থার কর্ণধার কল্যাণীয় শ্রীসন্দীপ নায়ক আমাকে নিশ্চিন্তমনে কাজটি করবার সুযোগ দিয়েছেন, সেকথা পূর্ববর্তী সংকলনখণ্ডগুলির ভূমিকায় বলেছি, সেই কথাই আবার বলি। সতত তাঁর কল্যাণকামনা করি সেইসঙ্গে।

এই খণ্ডের নির্দেশিকা কল্যাণীয় শ্রীঅভীককুমার দে-কৃত। এটি প্রস্তুতে আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী শ্যামলী মিত্রের কিছু সাহায্য তিনি পেয়েছেন। কাজ করে তিনিও আনন্দ পেয়েছেন, সেই প্রাপ্তিটাই বড়ো। তবে তিনি আমারও প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেটুকু তাঁকে জানিয়ে রাখি।

আমার মতো সর্বার্থে স্বল্পবিত্ত মানুষের পক্ষে এই সংকলনপ্রকল্প সফল করে তুলতে চাওয়া পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবাসনার সঙ্গে তুলনীয়। তবু যে পথ চলেছি, বাধায় ঠেকে দিশা হারাইনি, তার কারণ এক মুশকিল আসানকে সঙ্গে পেয়েছি। তিনি আমার ছাত্র অভীক। এ প্রসঙ্গে এইটুকুই থাক, খুব বেশি কথা যে সবসময় অধিকতর অর্থবহ কথা বলে, তা তো নয়। তবে এটা যোগ করা উচিত যে, ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অভীকের স্ত্রী সর্বাণীর ভূমিকা আমার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে এঁরা দুজনেই আজ আমার সব কাজেরই সহায়। যদ্দূর বুঝি, পথ চলতে চলতে এসব মুশকিল আসানরা যখন কাছে এসে পড়েন, এঁরা ঠিক বাইরের গরজে কাজ করেন না। বাইরে থেকে তাঁদের কাজের মূল্যস্বীকারে আমারও তাই মনের সায় নেই।

ক্ষণিকের ভুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি ঘটতে পারে, ঋণস্বীকারে কৃপণ হতে হয়তো পারি। আশা করি তা বলে একথা ভুলব না যে, জীবনের সব প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে সেই পরমবন্ধুর বার্তা এসে পৌঁছায়।

বৈশাখ, ১৪১৩
কলকাতা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

বঙ্গমানস

বাংলার মনসা পূজা ১৫
বাংলার প্রাণবস্তু ২৯
শিক্ষাসমস্যা ৪৮
মধ্যযুগে সাধনার পীঠ ঢাকা ৭২
সভাপতির অভিভাষণ ৮০
সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভান্ডারে বাংলার অবদানের ইতিহাস ৯৮
চিন্ময়বঙ্গ ১০৬
বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর ১১৫
বঙ্গের বাহিরে বাঙালি বেদাচার্য ১২১
বাংলার বাহিরে চৈতন্যমত ১২৯
বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মন্দিরে বাঙালি সেবক ১৩২
বাংলায় বৈদ্যবিদ্যা ও বৈদ্যশাস্ত্র ১৩৭
বাংলায় সংগীতাচার্য ১৪২
বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক সমস্যা ১৪৭
দোল উৎসব ১৬৯
বাঙালির ধর্ম ১৭৪
মহামায়ার আবির্ভাব ১৮৮
বাংলার মানবধর্ম ও বাউল ১৯৫
ঠাকুরানি দিধি ১৯৮
আগমনি গান ২০২
বাউল পরিচয় ২০৫
বাউল উৎসব ২৩৯
স্বখাত সলিলে ২৪৪
বাংলায় গণশক্তির উৎস ২৪৮

স্মৃতির আলোয়

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ২৫৫
মহামতি এন্ডরুজ ২৭১
কালীমোহন স্মৃতি ২৭৫
পূণ্যচরিত কথা ২৭৮
নরমুন্ড সাধক কাপালিক ২৮৫
মহাত্মাজির তিরোধান ২৯১
সাধুসন্ধানে ৩০৫

দেবীদর্শন ৩১১
সর্বরূপময়ী দেবী সর্বদেবীময়ং জগৎ ৩১৯
কাশ্মীরে তপস্বিনী ৩২৬
সর্বরূপিনীর পূজা ৩৩৫
ভক্ত কাহিনী ৩৪২
সর্বরূপময়ী দেবী ৩৪৭
স্বদেশি যুগের স্মৃতি ৩৫১
হিন্দু মুসলমান ৩৫৫
বিচিত্ররূপিনী ৩৬০
মেজোগিন্নি ৩৬৪
উল্‌টা সমঝ্‌লি রাম ৩৬৮
ভারত পথিক আচার্য জগদীশচন্দ্র ৩৭২

বিবিধ

বুদ্ধ চরিত ৩৭৭
তীর্থ যাত্রা ৩৮০
উদ্বোধন ৩৮৪
চরৈবেতি চরৈবেতি ৩৯০
প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ৩৯৮
ধর্ষিতা নারী ৪০১
কল্যাণমন্ত্র ৪০৫
বজ্রকূট মন্দির ৪০৮
কবি হুইটম্যানের বাণী ৪১০
পঞ্চনদবীর রসালূর কাহিনি ৪১২
কস্ত্রাতা মে ভবিষ্যতি ৪২০
[illegible]শে বসন্তোৎসব ৪২৪
মহনীয় সুভাষচন্দ্র ৪৩১
দুঃখের চিন্ময় আলোক ৪৩৭
রানি লক্ষ্মীবাই ৪৪২
রানি লক্ষ্মীবাইর দিনচর্যা ৪৪৬
চিনে আয়ুর্বেদ ৪৫০
জন্মমৃত্যু ৪৫৪
পাষাণ নৌকা ৪৫৯
সাধুর কেরামতি ৪৬২
ভক্ত তুলসীদাস ৪৬৭
জলন্ধরের জীবন্ত পূজা ৪৬৯
কবীর বট ৪৭৫

বাংলায় মনসাপূজা

সর্পপূজা নানা আকারে সারা জগৎ জুড়িয়াই আছে। বাংলায় অনেক লোক মনে করেন আমরাই বুঝি শ্রাবণ মাসে মনসার ভাসান শুনি এবং নাগপঞ্চমীতে নাগপূজা করি। কিন্তু আসলে প্রায় সব দেশেই এই প্রথা ছিল বা আছে। সেদিন *Encyclopædia of Religion and Ethics* পুস্তকখানির ১১শ খণ্ডে সর্পপূজা প্রকরণটি দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইলিয়াট স্মিথের মতে এই সর্পপূজা সব প্রথমে ছিল মিশর দেশে, খ্রিস্টজন্মের আটশো বৎসর পূর্বে। তারপর তাহা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সাপের পূজা বিশেষ কোনো এক দেশ হইতে অন্য সব দেশে ছড়াইয়াছে ইহা নাও হইতে পারে। সর্প সব দেশেই আশ্চর্য জীব। তার অদ্ভুত আকৃতি, তীব্র বিষ, ক্ষিপ্র গতি, ছয়মাস না খাইয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকা, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করা, দুইভাগ-করা জিহ্বার লক্‌লকানি, এইসবই সব দেশে বিস্ময় ও পূজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের মধ্যে, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে, মেলানেসিয়ায়, মেক্সিকোতে, চিনে, জাপানে, ক্রিটে, মিশরে, বাবিলোনিয়ায় হিব্রুভাষী জাতিদের মধ্যে, ফিনিসিয়ায়, গ্রিসে, রোম দেশে, কেল্‌টিক বাল্টো-স্লাভিক ও টিউটন জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই কোনো না কোনো যুগে, কোনো না কোনো আকারে সর্পজাতি পূজা পাইয়াছে এবং বহুস্থানে নানা আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রাবিড় জাতির ঐক্য যাঁরা মানেন তাঁরা ভারতের দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশে সর্পপূজার বাহুল্যে বিচারের একটি নূতন ক্ষেত্র পাইবেন।

সর্পের প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজার ভাব এক এক দেশে এক এক রকম। কোনো দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছাড়িয়া মৃত্যু জয় করিয়া নবজীবন লাভ করে। কোনো দেশে সর্প ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তানবৃদ্ধির চিহ্ন। এই বাংলাদেশেও লোকের বিশ্বাস আছে যে সর্প স্বপ্নে দেখিলে বংশবৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর বহু স্থানে সন্তানকামনায় সর্পপূজার পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই উদ্দেশ্যে কুমারীরা সর্পপূজা করে। কাজেই সন্তানকামনায় শিবপূজায় যাঁহারা লিঙ্গপূজা অনুষ্ঠানের পরিচয় পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পূজায় তাঁহাদের বিস্মিত হইবার হেতু নাই। শিবের সঙ্গে নাগের নিত্য যোগ অথচ মনসার সঙ্গে মহাবিরোধ, কাজেই মনসারূপিণী সর্প ও প্রাচীন নাগ এক নহে।

অভিচারাদি কর্মে, যাদুবিদ্যায়, পুরাণ ও ইতিকথায় সর্পের উল্লেখ ও সর্পের নানাভাবে ব্যবহার ও পূজা এদেশে ও নানা দেশে আছে। নারীধর্ম, সন্ততিলাভ ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সঙ্গে সর্পের ধারণা নানা দেশেই জড়াইয়া আছে। আমাদের দেশেও আছে।

এই ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে সর্পপূজার বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতি। কাশ্মীরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পঞ্জাবে, মধ্যভারতে, কাশী কোশল মগধে, দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে, আসামে খাসিয়া পর্বতে, মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তবাসী জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই সর্পপূজা আছে। নেপাল, ভোটান প্রভৃতি পর্বতবাসীদের মধ্যেও আছে। নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্পের নামে কত মন্দির, পুর ও শিলা এখনও ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে — নাগপত্তন, নাগপুর, তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামে সে পরিচয় পাই।

কিন্তু বাংলাদেশের যে মনসাপূজা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। আমরা তার মূলের একটু সন্ধান লইতে চাই।

কাশীতে ভারতের সব প্রদেশের লোকেই আসা-যাওয়া করেন— তাঁরা সবই প্রাচীন ভাবের লোক। তাঁদের আচার ও পদ্ধতি লক্ষ করিলে প্রাচীনকালের ভালো পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমার জন্মভূমি কাশীতে, তাই ছেলেবেলায় লক্ষ করিতাম— সব জাতিই নানাভাবে সর্পপূজা করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন প্রকারের পূজার সঙ্গে মনসা পূজার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব?

সব প্রদেশেই দেখিলাম সর্পকে কোনো-না-কোনো বিশেষ জাতির মানুষেরা আপনাদের আদিপুরুষ ও প্রধান দেবতা ও উপাস্য দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। নাগা জাতির কোনো কোনো শাখা ও অগ্রবাল জাতি নাগের বংশ বলিয়া খ্যাত। সর্প মারিলে নরহত্যা হয়, এমনকি ব্রহ্মহত্যাও হয়। তাহার হেতু বোধহয় *মহাভারতের* আস্তীক পর্বটি দেখিলে বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের সর্পপূজার উল্লেখ আজ করিব না। বেদেও বিস্তর সর্পপূজন ধর্মের পরিচয় আছে। নাগরা তখন এক পরাক্রমশালী জাতি। তাহাদের সঙ্গে আর্য ও ব্রাহ্মণাদির বিবাহ হইত। জনমেজয় যখন সরমা-দত্ত শাপ নিবারণের জন্য যোগ্য পুরোহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তখন তাঁহার যজ্ঞের পৌরোহিত্যে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি শ্রুতশ্রবা ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকে বরণ করিলেন। তাহাতে শ্রুতশ্রবা বলিলেন, আমার এই পুত্র "সর্পকন্যার গর্ভে জাত মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মৎতপোবীর্য্যসম্ভূত" (*মহা*, আদি, পৌষ্য। ১৭ শ্লোক); যদিও এই ক্ষেত্রে ঠিক বিবাহ হয় নাই। কিন্তু জরৎকারু ছিলেন মহাতপা ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী (*মহা*, আদি, ৪৫ অ)। তিনি একদিন এক বিজন বনে তাঁহার পিতামহ শংসিত-ব্রত ঋষিদের দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারা জরৎকারুর সন্ততির অভাবে অধোলোকে যাইতে বসিয়াছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে অধোগামী পিতামহগণ বলিলেন, "জরৎকারু নামে আমাদের এক বংশধর আছে। সে তপস্যাই করিবে, বিবাহ করিবে না। তবে আমরা অধোগতি হইতে রক্ষা পাই কেমন করিয়া?" তখন জরৎকারু আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি অতি দরিদ্র, আমাকে কে কন্যা দিবে?" পিতৃগণের মুখে তিনি শুনিলেন তাঁহাদের রক্ষার জন্য জরৎকারুর বিবাহ ও সন্ততি লাভ করাই চাই। তিনি সর্বদেশ ঘুরিয়াও পাত্রী না পাইয়া, একদিন অরণ্যে মনের দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি দরিদ্র। এতকাল আমি উগ্র তপস্যায় রত ছিলাম। আজ পিতৃগণের নির্দেশে বিবাহ করিতে চাই। কেহ আমাকে কি কন্যা দিবে?" তখন নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার হস্তে দেন (*মহা*, আদি, ৪৬ অ)। এই বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এই বিবাহই সফল হইয়া জরৎকারুর পিতৃগণকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে। এই বিবাহে মহাতপস্বী আস্তীকের জন্ম হয়। তিনি জনমেজয়ের যজ্ঞে গিয়া প্রার্থনা করেন যে সর্পসত্রের বিরাম হউক। ইহা বলিয়া তিনি আপনার পরিচয় দেন। আস্তীক বলিলেন, "মাতুলবংশ আমার নাগকুল, তাই তাঁহাদের রক্ষার জন্য এই বর প্রার্থনা করি।" জনমেজয় কহিলেন, "হে দ্বিজবরোত্তম, অন্য বর প্রার্থনা করুন" (*মহা*, আদি, ৫৬ অ)। তখন যজ্ঞের বেদবিৎ সদস্যগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণকে নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক" (৫৬ অ)। তখন আস্তীককে নানাবিধ দান দিয়া রাজা বিদায় করিয়া কহিলেন, "এই যজ্ঞ তো নিবৃত্তই হইল, তবে আমার পুরীতে পুনরায় আপনার আসিতে হইবে। আমার মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা আছে। তাহাতে আপনিই সদস্য হইবেন" (*মহা*, ৫৮ অ, ১৬ শ্লোক)। নাগকন্যার গর্ভে জন্ম হইলেও ইঁহার বিপ্রত্ব ও ঋষিত্ব কিছুমাত্র দোষগ্রস্ত হয় নাই।

মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্বগুলি আগাগোড়া নাগদের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। পৌষ্যপর্বে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে (*মহা*, আদি, পৌষ্য, ১৭১ শ্লোক)। সেখানে দেখিতে পাই ঋষি শৃঙ্গী রাজা পরীক্ষিতের উপর রুষ্ট হইয়া নাগরাজ তক্ষককে শত্রু দমনে নিযুক্ত করিতেছেন (*মহা*, আদি, ৪০,৪৯ অ)। ব্রাহ্মণ কাশ্যপ পরীক্ষিত রাজার বিপদের প্রতিকার করিতে আসিতেছিলেন। তাহাতে তক্ষক তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ হইয়া আপনি দাঁড়াইবেন? কাশ্যপ অর্থাভিলাষী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া তক্ষক নিবৃত্ত করিলেন (*মহা*, আদি, ৪৩ অ)। ইহাতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় নাগরাজ কেমন সচেষ্ট।

সর্পসত্রে ক্ষত্রিয় রাজারা নাগকুল নির্মূল করিতে চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই। নাগকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ তপস্বী তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও নাগদের মধ্যে বেশ ঐক্য ও প্রীতির ভাব আছে।

খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জুন তক্ষকাদি নাগগণকে ও দানব প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীকে নিঃশেষ করিতে চাহেন। তখন দেখিতে পাই তক্ষক ইন্দ্রের সখা (আদি, ২২৪ অ, ৬ শ্লোক)। নাগেরা (হস্তীরা) শুণ্ডে জল আনিয়া বনকে দাহ হইতে বাঁচাইতে চাহে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই (আদি, ২২৫, ৭৩)। তখনও খাণ্ডবদাহে দেখা যায় ইন্দ্র নাগদের সহায় (আদি, ২২৭, ২৯)। অগ্নি জীবকুলকে ধ্বংস করিতেছেন আর কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রে পলায়মানেরাও রক্ষা পাইতেছে না (*মহা*, আদি, ২২৮ অ)। কেবল অরণ্য দগ্ধ করিয়া জনবসতি বৃদ্ধি করিতে হইলে এরূপ নিষ্ঠুর হইবার প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণার্জুন যে নাগলোক ধ্বংস করিয়া অগ্নির তৃপ্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তক্ষককে তো মারা গেল না। পূর্ব হইতেই কুরুক্ষেত্রে পালাইয়া তিনি রক্ষা পান। তাঁহার পত্নী আপন পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং মারা যান। অশ্বসেন অতি কষ্টে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধূমের মধ্য দিয়া অলক্ষিতভাবে পালায়। বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন কৃষ্ণার্জুন তাহাকে পাইলেন না তখন তাহাকে শাপ দিলেন, "তুমি আশ্রয়হীন হইবে" (*মহা*, আদি, ২২৯ অ, ১১ শ্লোক)। সত্যই তো, তাহাদের আশ্রয় ছিল যে বন, তাহা দগ্ধ হইলে তাহার আশ্রয় আর রহিল কোথায়? মনসা পুরাণাদির মতে এই জন্যই অর্জুন বংশের সঙ্গে নাগদের চিরশত্রুতা এবং পরীক্ষিতকে নাগেরা বিনষ্ট করে (বংশীদাসের *পদ্মাপুরাণ*, পৃ. ১২৮)।

সেই বনেই দেখিতে পাই মন্দপাল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিবাহ ও অপত্য উৎপাদন না করিয়া কৃচ্ছ্রতপ সাধন করিতে গেলেন। ফল হইল না। পিতৃলোকের গতি হইল না। দেবতারা বলিলেন, বিবাহ করিয়া অপত্য লাভ করো (*মহা*, আদি, ২৩১ অ, ৫–১৪ শ্লোক)। মহর্ষি মন্দপাল সহজে বহু সন্ততি চান। তিনি খাণ্ডবে তির্যক্‌যোনিজাত কন্যা জরিতাকে বিবাহ করিয়া চারিজন ব্রহ্মবাদী পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন আবার তিনি লপিতাকে বিবাহ করেন। মন্দপাল অগ্নিকে স্তব করিয়া তাঁর বংশধরেরা খাণ্ডবে অগ্নিদাহে রক্ষা পাইবে এইরূপ অভয় পান (*মহা*, আদি, ২৩১ অ, ২৩–৩৩ শ্লোক)। বনদাহকালে ঋষিপত্নী, পক্ষীকন্যা জরিতা যখন তাঁর চারি পুত্র লইয়া বিব্রত তখন তাঁর মনে হইল— "গমনকালে তো মহর্ষি কহিয়া গিয়াছেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্র জরিতারি কুলপ্রতিষ্ঠা হইবে [করিবে]। সারিসৃক্ক পিতৃগণের জন্য কুলবর্ধন করিবে। তৃতীয় পুত্র স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে। চতুর্থ দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ হইবে" (আদি, ২৩২ অ, ৯-১০ শ্লোক)। কিন্তু এখন ইহাদের রক্ষা হয় কীসে? শেষে পুত্রেরা মাতাকে বলিল, "আমরা মারা যাইবই। তবে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করো। এখনও সন্তানলাভের